জাত-ব্যবস্থা
(CASTE-SYSTEM)

ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক অসমতা নির্ভর জাতিভেদ প্রথাকে বোঝানোর জন্য 'কাষ্ট' (Caste) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। শব্দটির উৎপত্তি পর্তুগীজ 'casta' থেকে। স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ ভাষায় 'কাষ্টা' অর্থ কুল, বংশ বা বংশগত গুণাবলী। 'জাতি' বোঝাতে 'কাষ্ট' শব্দটির ব্যবহার প্রথম থেকেই কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে।

ভারতবর্ষের জাতি-প্রথা অত্যন্ত জটিল এবং সুগঠিত। যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে অন্য সমাজ ব্যবস্থাগুলি থেকে পৃথক হিসেবে উপস্থাপিত করে, জাতি ব্যবস্থা এদের মধ্যে অন্যতম। তবে ভারতের জাতি-ব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনা মোটেই সহজ-সরল প্রকৃতির নয়, অধ্যাপক এস. সি. দুবের মতে, ভারতীয় সমাজ কাঠামোর প্রধান প্রধান বিভাজন ও উপবিভাজনের চেহারা যেমন জটিল, তেমনই বিভ্রান্তিকর। এই জটিল কাঠামোর চিত্রকে একটা সীমার বাইরে সরল করে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করলে সামাজিক বাস্তবতার চিত্রটাই বিকৃত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অধ্যাপক দুবে মনে করেন, কোনো অঞ্চল বিশেষের ওপর সামাজিক গবেষণা নির্দিষ্ট এলাকার সামাজিক কাঠামোর গঠন প্রকরণ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য দিতে পারলেও সারা ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে সেই তথ্য যথেষ্ট নাও হতে পারে। কারণ, বহুত্ববাদী ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক কাঠামোর গতিপ্রকৃতি ভিন্ন। অধ্যাপক এম. এন. শ্রীনিবাস অবশ্য মনে করেন যে, জাতিপ্রথা নিঃসন্দেহে এক সর্বভারতীয় ব্যবস্থা বিশেষ এই অর্থে যে এর মধ্যে সবার স্থানই জন্মসূত্রে নির্ধারিত, স্থানীয় গোষ্ঠীসমূহ এক একটি বিন্যাস গঠন করে এবং তাদের সকলেই সাবেক যুগ থেকেই এক একটা নির্দিষ্ট পেশার সঙ্গে যুক্ত।

ঔপনিবেশিক সমাজতত্ত্ব চর্চায় ভারতীয় জাতি-ব্যবস্থা প্রথম থেকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল কারণ বিষয়টি ছিল একান্তভাবেই ভারতীয়। অধ্যাপক লিচ এবং লুই ডুমোর মতে, 'জাতি হলো ভারতীয় সভ্যতার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বিন্যাস'। অধ্যাপক আঁদ্রে বেতে ভারতীয় সমাজকে 'কাষ্ট সোসাইটি' বলে মেনে নেওয়ার বিরোধী। এ বিষয়ে তিনি লিচ ও ডুমোর ধারণার সমালোচনা করেন। 'মূল্যবোধ' এবং 'ধারণা'কে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ শুরু করায়

Scanned with CamScanner

অধ্যাপক আঁদ্রে বেতে ডুমো প্রমুখের বিরুদ্ধে 'বাস্তবতাকে বিকৃত' করার অভিযোগ তোলেন। তাঁর মতে, ভারতীয় সমাজ বিশ্লেষণে জাতি-ব্যবস্থাকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাস্তব জীবন অনেক গতিশীল এবং তা বেশি গুরুত্ব দাবি করে। জাতি-ব্যবস্থার ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলে আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্বগুলি থেকে সমাজতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি অন্যত্র অপসারিত হচ্ছে।

❑ জাতির সংজ্ঞা

জাতির কোনো একটি নির্দিষ্ট সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া খুব কঠিন। যাঁরা এ ধরনের চেষ্টা করেছেন তাঁরা পারতপক্ষে জাতির বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা দেওয়াতেই ব্যাপৃত থেকেছেন। জাতির সংজ্ঞা দেওয়ার প্রচেষ্টায় হারবার্ট রিসলে বলেছেন—জাতি হল অনেক পরিবারের বা পরিবারের অনেক দলের সমষ্টি। এর একটি সাধারণ নাম থাকে। এর সদস্যদের একটি নির্দিষ্ট পেশা থাকে। এরা নিজেদের এক কাল্পনিক পূর্ব পুরুষ থেকে উদ্ভূত বলে মনে করে। অধ্যাপক এন. কে. দত্ত বিস্তারিতভাবে জাতিপ্রথা বর্ণনা করেছেন—'নিজের জাতি ব্যতীত বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ সংঘটিত হয় না। বিবাহ রীতির অনুরূপ কঠোরতা মানা না হলেও বিভিন্ন জাতির মধ্যে জল ও খাদ্য গ্রহণে বাধা নিষেধ আছে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে উচ্চ-নীচ স্তরভাগ দেখা যায়। এই স্তর বিন্যাসের সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী ব্রাহ্মণ। জন্মসূত্রেই ব্যক্তি বিশেষের জাতি নির্ধারিত হয়। সারা জীবনই ব্যক্তিকে তার নিজের জাতির মধ্যেই কাটাতে হয়। উপরের বা নিচের জাতিতে উত্তরণ বা অবনমনের সম্ভাবনা থাকে না।'

অধ্যাপক এস. সি. দুবের মতে, জাতি বিষয়ে যে কোনো সরলীকৃত ব্যাখ্যাও যথেষ্ট জটিল মনে হতে পারে। কিন্তু, এই জটিলতা এড়ানর উপায় নেই কারণ বাস্তব সমাজ চিত্রটাও জটিল। ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠী ও আচার-সংস্কারের সমাবেশ ঘটায় এর মধ্যে একটা সার্বিক ও সুসমঞ্জস কাঠামো খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবু এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও অধ্যাপক আঁদ্রে বেতে জাতির সংজ্ঞা নির্ণয়ের যে প্রয়াস করেছেন তা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে—জাতি হল নির্দিষ্ট নামে চিহ্নিত এক ক্ষুদ্রাকার জনগোষ্ঠী যার সদস্যগণ অন্তর্বিবাহ রীতি, বংশগত সদস্যপদ এবং একটি সুনির্দিষ্ট জীবনশৈলী অনুসরণ করে চলে। এই জীবনশৈলী সাধারণত পরম্পরাগত নির্দিষ্ট পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকে। ক্রমোচ্চ বিভাজিত ব্যবস্থার অধীন কম বেশি স্বতন্ত্র ধর্মীয় পদমর্যাদার সঙ্গেও তা সংযুক্ত থাকে। এর ভিত্তি মূলে রয়েছে পবিত্রতা-অপবিত্রতা সম্পর্কিত ধারণা।

জাতির বৈশিষ্ট্য

অধ্যাপক জি. এস. ঘুরে জাতি প্রথার ছয়টি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও জাতির বিভিন্ন সংজ্ঞা ও ধারণা পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতি-প্রথার কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়—

Scanned with CamScanner

১। জন্মসূত্রে নির্ধারিত

জাতি ব্যবস্থা জন্মভিত্তিক। জাতির সদস্যপদ জন্মসূত্রে নির্ধারিত হয়। তাকে আজীবন সেই জাতির পরিচয়ই বহন করতে হয়। গুণগত যোগ্যতার নিরিখে জাতি পরিবর্তন করা যায় না। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করলে ব্রাহ্মণ, জেলের ঘরে জন্মালে জেলে, মুচির ঘরে জন্মালে ব্যক্তি মুচি বলে চিহ্নিত হয়। অর্থাৎ বংশানুক্রমিতা জাতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

২। অন্তর্বিবাহ

অধ্যাপক এস. সি. দুবের মতে, অন্তর্বিবাহ মেনে চলে এমন জনগোষ্ঠীই জাতি। প্রত্যেক জাতিভুক্ত পাত্র-পাত্রীকে সেই জাতির মধ্যেই বিবাহ করতে হয়। অন্য কোনো জাতির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ককে লোকনীতি বিরুদ্ধ মনে করা হয়। যেমন, জাতির নিয়ম অনুসারে ব্রাহ্মণের সাথে ব্রাহ্মণেরই বৈবাহিক সম্পর্ক হয় অন্য জাতির সাথে হয় না।

৩। জাতিগত বৃত্তি বিভাগ

প্রত্যেকটি জাতির একটি পেশা বা বৃত্তি নির্দিষ্ট থাকে। জাতির নিয়ম অনুসারে জাতিভুক্ত সকলকেই সেই জাতির পেশাই গ্রহণ করতে হয়। সাধারণত এক জাতির পেশায় অন্য জাতিভুক্তরা নিযুক্ত হতে পারে না। কারো কারো মতে, প্রত্যেকটি জাতি যেহেতু এক একটি পেশাদার গোষ্ঠী তাই এ হচ্ছে এক ধরনের শ্রমবিভাগ ব্যবস্থা। এর ফলে বিশেষীকরণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

৪। জাতিভিত্তিক সামাজিক স্তরবিন্যাস

সামাজিক স্তরবিন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হল ভারতবর্ষের জাতি-ব্যবস্থা। জাতিপ্রথা বংশানুক্রমিক অবস্থিতির ভিত্তিতে সমাজকে একটি ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিন্যস্ত ব্যবস্থায় বভক্ত করে রাখে। অধ্যাপক এস. সি. দুবের মতে, জাতিগুলি সামাজিক পদমর্যাদার দিক থেকে উঁচু-নিচু নানা স্তরে বিন্যস্ত। এই উঁচু নিচু অবস্থানের তারতম্যের সঙ্গে জাতিগত পেশার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। সাধারণভাবে নিয়ম হল, 'শুদ্ধ' ও 'মহৎ', পেশার সঙ্গে যুক্ত জাতি সমাজে উঁচু মর্যাদার আসন পাবে। 'অশুচি' এবং 'কলুষিত' পেশার জাতি সামাজিক স্তরবিন্যাসে নিচের দিকের আসন পাবে। তাই ব্রাহ্মণ জাতির সামাজিক মর্যাদা উঁচুতে কারণ তাঁরা ধর্মীয় কাজে নিযুক্ত। আবার মেথর অপরিচ্ছন্ন কাজে নিয়োজিত তাই সমাজে তাঁদের স্থান নিচুতে।

৫। সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র

সংস্কৃতিগত স্বাতন্ত্র জাতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। অধ্যাপক জি. এস. ঘুরের মতে, বৃহত্তর সমাজের অংশ হয়েও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলি তাদের নিজস্ব সামাজিক জগতের মধ্যে অনেকটাই সম্পূর্ণ। প্রত্যেকটি জাতির জীবনধারাগত স্বাতন্ত্রতা বিদ্যমান।

Scanned with CamScanner

৬। সামাজিক বিধিনিষেধ

জাতি প্রথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সামাজিক বিধিনিষেধ মেনে চলা। জাতিগুলির আন্তর্সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক এস. সি. দুবের মতে, কোনো জাতি কতটা 'শুদ্ধ' বা 'অশুদ্ধ' তার উপরেই জাতিগুলির মধ্যে সামাজিক আদান প্রদানের বিষয়টা নির্ভর করে। তাঁর মতে, যে জাতির অবস্থান সমাজে যত উঁচুতে 'শুদ্ধতা' বজায় রাখার লক্ষ্যে তাঁদের আচার-সংস্কার তত জটিল। স্তরবিন্যাসের উচ্চ স্তরে অবস্থিত ব্রাহ্মণ জাতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও পূজা অর্চনায় যুক্ত বলে তাদের 'শুদ্ধাচারে' চলতে হয়। সমাজের নিয়ম অনুসারে ব্রাহ্মণরা অন্য 'শুদ্ধ' পেশার জাতিভুক্ত মানুষের হাত থেকে খাদ্য পানীয় গ্রহণ করতে পারবে। এরা 'জলচল'। 'অশুদ্ধ' পেশার 'নীচু' জাতির মানুষের কাছ থেকে ব্রাহ্মণ সাধারণত জলগ্রহণ করে না। এদেরকে বলে 'অজলচল'।

৭। জাতিপ্রথার স্থিতিশীলতা

জাতিপ্রথায় সামাজিক সচলতার অভাব দেখা যায়। এই প্রথা স্থিতিশীল হওয়ার কারণ হিসেবে অনেকে সনাতন ভারতীয় সমাজে ধর্মীয় ধ্যানধারণার প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক এম. এন. শ্রীনিবাস এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, কর্মের ধারণা (Notion of Karma) একজন হিন্দুকে এই শিক্ষাই দেয় যে সে একটি বিশেষ জাতিতে জন্মগ্রহণ করেছে কেননা ওই জাতিতে জন্মগ্রহণের মতোই তার যোগ্যতা ছিল এবং তার কৃতকর্মের ফল স্বরূপই সে তা অর্জন করেছে।

কোনো বিশেষ জাতিভুক্ত ব্যক্তি যদি তার জাতি নির্দিষ্ট পেশা পরিবর্তন করতে চায় তবে সে অন্য জাতি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় তাই শুধু নয়, জাতির সদস্যরাও তাকে বাধা দেয়। প্রকৃতপক্ষে, যুগ যুগ ধরে চলে আসা যজমানি সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো এক প্রজন্মে এসে বৃত্তি পরিবর্তন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে দাড়ায়।

❑ বর্ণ ও জাতি

ঋগ্বেদের পুরুষসুক্তের ভাষ্যে 'বর্ণ' প্রসঙ্গে আলোচনা আছে। শাস্ত্র অনুসারে, হিন্দু সমাজ চারটি বর্ণে বিভক্ত—(ক) ব্রাহ্মণ, যাঁরা পূর্জাচনা ও বিদ্যাচর্চা করেন, (খ) ক্ষত্রিয়, যাঁরা শাসক ও যোদ্ধা, (গ) বৈশ্য, যাঁদের বৃত্তি ব্যবসা, কৃষি কাজ, গোপালন প্রভৃতি এবং (ঘ) শুদ্র, জাত-পেশার সাহায্যে উপরের তিন বর্ণকে সেবা প্রদান করাই শাস্ত্র অনুসারে তাঁদের কাজ।

দৈবতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এটা বিশ্বাস করা হয় যে একটি উপযুক্ত সমাজ-ব্যবস্থা তৈরির উদ্দেশ্যে সৃষ্টিকর্তা নিজেকে ধ্বংস করেছিলেন। সৃষ্টিকর্তার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয় এবং জানু থেকে জন্ম নিয়েছিল বৈশ্য। শূদ্রের জন্ম তাঁর চরণ থেকে। অধ্যাপক এস. সি. দুবের মতে, মানব জন্মের এই উৎস সন্ধানকে চতুর্বর্ণের সামাজিক

Scanned with CamScanner

অবস্থানের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করা যায়।

গীতার ভাষ্য অনুযায়ী, গুণ ও কর্মের বিভাগের ভিত্তিতে বর্ণভেদ করা হত। সেই অনুসারে, ব্রাহ্মণ সন্তানও ভ্রষ্টাচারী হলে সামাজিকভাবে পতিত হত। আবার দাসীপুত্র নিজের গুণের সাহায্যে দ্বিজত্ব লাভ করতে পারত।

অধ্যাপক এন. কে. দত্তর মতে, বাস্তবক্ষেত্রে, বংশানুক্রমিকতাকে হিন্দু শাস্ত্রে স্বীকার করা হয়। এটা ধরে নেওয়া হয় যে ব্রাহ্মণ সন্তান ব্রাহ্মণের গুণসম্পন্নই হবে। সুতরাং পেশা হিসেবে সে পূজার্চনা ও বিদ্যাচর্চা করবে। একইভাবে শুদ্র সন্তান তাঁর জাত-নির্দিষ্ট পেশায় পারদর্শী হবে। এইভাবে, বাস্তবে বর্ণভেদ বহুলাংশে জন্মভিত্তিক হয়ে দাঁড়ায়।

কোনো কোনো সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন, জাতি-ব্যবস্থা বর্ণব্যবস্থারই রূপান্তরিত রূপ। যদিও বর্ণ মাত্র চারটি, কিন্তু জাতি অসংখ্য। এস. সি. দুবের মতে, সামাজিক স্তরবিন্যাসে বিভিন্ন জাতির অবস্থান নির্দেশক মাপকাঠিই বর্ণ। এক একটি বর্ণের স্তরে মোটামুটিভাবে একই মর্যাদাসম্পন্ন একাধিক জাতির অবস্থান নির্দিষ্ট হয়। কারও কারও অভিমত হল, চারটি বর্ণের সাহায্যে নানা বৃত্তিধারী তিন সহস্রাধিক জাতিকে বোঝা সম্ভব নয়। বর্ণের সাহায্যে জাতি ব্যবস্থাকে বুঝতে বুঝতে গেলে জাতির উৎপত্তি, ক্ষমতা, তাৎপর্য—কিছুই সঠিকভাবে অনুধাবন করা যাবে না।

বর্ণ ও জাতির পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অধ্যাপক এম. এন. শ্রীনিবাস যে মত প্রকাশ করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, বর্ণ ব্যবস্থায় যে চতুর্বর্ণের উল্লেখ করা হয় তার মধ্যে তথাকথিত 'অস্পৃশ্যদের' অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। সুতরাং বর্ণব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতীয় সমাজ বিশ্লেষণে বিশাল সংখ্যার ভারতবাসীর সামাজিক অবস্থান খুব কমই উপস্থাপিত হয়। 'অশুদ্ধ' পেশায় নিযুক্ত থাকার ফলে আধিপত্যকারী উচ্চবর্ণের মানুষেরা এই সব তথাকথিত 'অস্পৃশ্য'দের বর্ণব্যবস্থার মধ্যে স্থান দেন না। কিন্তু, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনোভাবেহ তাঁদের সমাজবহির্ভূত হিসেবে গণ্য করা যায় না। অনেক সমাজতাত্ত্বিকই এখন একথা মনে করেন যে, ভারতবর্ষের সামাজিক স্তরবিন্যাস বিশ্লেষণের একক হিসেবে 'বর্ণব্যবস্থার' চাইতে 'জাতি-ব্যবস্থা' সমাজ গবেষণায় অনেক বেশি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

❑ জাতি ব্যবস্থা ও সামাজিক সচলতা : সংস্কৃতায়নের (Sanskritization) ভূমিকা

অধ্যাপক রাম আহুজা ভারতবর্ষের জাতি ব্যবস্থা সংক্রান্ত আলোচনাকে তিনটি প্রেক্ষিতে ভাগ করেছেন—ইন্দোলজিকাল বা ভারততাত্ত্বিক, সমাজ-নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক। ইন্দোলজিস্টরা জাতি প্রথাকে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে বিচার করেছেন; সমাজ নৃতাত্ত্বিকরা বিষয়টিকে দেখেছেন সংস্কৃতিগত দিক থেকে আর সমাজতাত্ত্বিকদের ভারতীয় জাতি ব্যবস্থা সংক্রান্ত বিশ্লেষণ মূলতঃ সামাজিক স্তরবিন্যাসগত প্রেক্ষাপটে। তার ফলেই ভারতবর্ষের

Scanned with CamScanner

সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকৃতি অনুধাবনের উদ্দেশ্যে জাতি-ব্যবস্থায় সামাজিক সচলতার বিষয়টি সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ভারতের জাতিপ্রথা সম্পর্কে খ্রিস্টান মিশনারী ও ব্রিটিশ প্রশাসকদের প্রচারে প্রভাবিত হয়ে অনেকে একে অনড় অচল প্রথা হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁদের কাছে জাতিপ্রথা সামাজিক অচলায়তনের উৎস। এই ব্যবস্থায় সামাজিক সচলতার পথ একেবারে রুদ্ধ। তবে, বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক এম. এন. শ্রীনিবাস এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি ভারতীয় জাতি-ব্যবস্থায় সামাজিক সচলতা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সংস্কৃতায়ন (Sanskritization) ধারণার উপস্থাপনা করেছেন। তাঁর মত অনুযায়ী, অনেক সময় কোনো 'নীচু' জাতি সামাজিক স্তরবিন্যাসের 'উঁচু' জাতির পেশা, জীবনধারা প্রভৃতি অনুকরণের মাধ্যমে উন্নততর স্তরে উন্নীত হতে প্রয়াসী হয়। এই প্রয়াসকেই সমাজতাত্ত্বিক এম. এন. শ্রীনিবাস 'সংস্কৃতায়ন' নামে অভিহিত করেছেন। অধ্যাপক শ্রীনিবাসের ভাষায়—'সংস্কৃতায়ন হচ্ছে এমন এক প্রক্রিয়া যার দ্বারা 'নীচু' জাতির হিন্দু বা আদিবাসী ও অন্যান্য গোষ্ঠী স্বকীয় আদর্শ, আচার-অনুষ্ঠান এবং জীবনধারা পরিবর্তন করে 'উঁচু জাতির' বা দ্বিজবর্ণের সমান হতে চেষ্টা করে। সাধারণত, এই পরিবর্তনের পরেই তাঁরা জাতি-বিন্যাসে আরও উঁচু স্থান দাবি করে। সনাতন ধারণায় স্থানীয় সমাজ আগে তাঁদের যে স্থান দিত তার চেয়ে উপরে উঠবার চেষ্টা করে।' শ্রীনিবাসের মতে, অপেক্ষাকৃত 'উঁচু' জাতি হিসেবে সামাজিক স্বীকৃতি পাওয়ার এই প্রয়াস ও দাবি সহজে স্বীকৃত হয় না। সাধারণত, এক বা দুই প্রজন্ম ধরে এই দাবি চলতে থাকে। ক্রমশ এই দাবি সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে।

অধ্যাপক শ্রীনিবাস ১৯৫২ সালে 'রিলিজিয়ন এ্যান্ড সোসাইটি এ্যামঙ দ্য কুর্গস অব সাদার্ন ইন্ডিয়া' গ্রন্থে সর্বপ্রথম 'সংস্কৃতায়ন' ধারণাটি তুলে ধরেন। ১৯৬৩ সালে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বক্তৃতা মালায় তিনি আরও বিশদভাবে এই তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন। পরবর্তী সময় 'সোসাল চেঞ্জ ইন মর্ডান ইন্ডিয়া' গ্রন্থে পরিমার্জিত রূপে তা প্রকাশিত হয়।

প্রথমদিকে, অধ্যাপক শ্রীনিবাস সংস্কৃতায়নকে ব্রাহ্মণ্যকরণ প্রক্রিয়ার অনুরূপ হিসেবে উপস্থাপিত করলেও পরবর্তী সময়ে তিনি তার পরিবর্তন করেন। এই প্রক্রিয়ায় ব্রাহ্মণ ছাড়াও নজীরস্থাপক গোষ্ঠী (Reference group) হিসেবে অন্যান্য প্রভাবশালী গোষ্ঠীর গুরুত্বও তিনি স্বীকার করেন। তাঁর ভাষায়—'এখন আমি বুঝতে পারছি যে কুর্গদের সমাজ ও ধর্মের উপর আমার গ্রন্থ এবং 'নোট অন স্যানসক্রিটাইজেশন অ্যান্ড ওয়েষ্টারনাইজেশন' বইতে আমি সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ায় ব্রাহ্মণ্য মডেলের উপর শুধু জোর দিয়েছি। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের মডেল সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করিনি।' তাঁর মতে, সাধারণভাবে দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণের আদর্শ, উত্তরে ক্ষত্রিয় আদর্শ, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে বৈশ্য আদর্শ 'নীচু জাতি'র পক্ষে অনুকরণীয় বলে মনে করা হয়। রামপুর গ্রামে গবেষণা করতে গিয়ে শ্রীনিবাস লক্ষ্য করেন যে উচ্চবর্ণভুক্ত না হয়েও সংখ্যাবহুল নির্দিষ্ট পেশাজীবী জনসমষ্টি অর্থনৈতিক ক্ষমতার জোরে এক একটি অঞ্চলে আধিপত্যকারী জাতিতে (Dominant caste) পরিণত হয়েছে। আধিপত্যকারী জাতি

Scanned with CamScanner

ও সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার যৌথ প্রভাবে সনাতন জাতিপ্রথার অচলায়তন ভেঙে গিয়ে ভারতীয় জাতি-প্রথায় সামাজিক সচলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। 'মবিলিটি ইন দ্য কাস্ট সিস্টেম' প্রবন্ধে অধ্যাপক এম. এন. শ্রীনিবাস এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

সংস্কৃতায়নের ফলে যে গতিশীলতার উদ্ভব হয় তা শুধু সমাজব্যবস্থায় স্থিতিগত পরিবর্তন আনে, এতে কাঠামোয় কোনো পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ কোনো একটি জাতি প্রতিবেশির চেয়ে একটু উপরে উঠল, অন্য একটি জাতি হয়ত একটু নেমে এল—এই সব পরিবর্তনই হচ্ছে সামাজিক স্তরবিন্যাসের একটি নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে। এতে সমাজ কাঠামোয় কোনো ধরনের মৌলিক পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে না। অধ্যাপক শ্রীনিবাসের ভাষায়—'সাবেক কালে জাতি প্রথার এই গতিশীল বৈশিষ্ট্যের দরুণ কোনো বিশেষ জাতিগোষ্ঠী বা জাতির একাংশের অবস্থানগত পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু, কাঠামোগত কোনো পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ বিশেষ কোনো জাতি উপরে উঠেছে বা নীচে নেমেছে কিন্তু কাঠামো একই রয়ে গেছে।'

অধ্যাপক এম. এন. শ্রীনিবাস 'সংস্কৃতায়ন' ধারনার উপস্থাপনার মাধ্যমে ভারতীয় সমাজের সামাজিক পরিবর্তনের বিবর্তনমূলক দিকটিকেই উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর মতে, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একদিকে যেমন জাতির মর্যাদাগত পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয়, আবার অন্যদিকে এই প্রক্রিয়া সামগ্রিক কাঠামোগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। 'দ্য কোহেসিভ রোল অব সানসক্রিটাইজেশন অ্যান্ড আদার এসেজ' গ্রন্থে তিনি সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার সংরক্ষণমূলক দিকটিকেই মূলতঃ বিশ্লেষণ করেছেন।

অধ্যাপক আঁদ্রে বেতে শ্রীনিবাস প্রদত্ত 'সংস্কৃতায়ন' ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে এটা এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো জাতি উঁচু জাতির সনাতন জীবনধারা অনুসরণ করে সামাজিক স্তরবিন্যাসে উঁচু স্থানে যেতে চায়। তাঁর মতে, সংস্কৃতায়নের ছককে অবিকল একভাবে দেখা উচিত নয় কারণ ক্ষেত্রবিশেষে দেখা গেছে ব্রাহ্মণবাদী ছক ছাড়াও ক্ষত্রিয় এমনকি বৈশ্য ছককে ব্যবহার করা হয়েছে। বেতে মনে করেন, সংস্কৃতায়নের বিশেষত্ব হচ্ছে যে তা একান্তভাবে সাবেকী। তবে সংস্কৃতায়ন অতীতের সাথে বর্তমানের পরম্পরাগত যোগসূত্রও বটে। এর প্রতীক ও মূল্যবোধসমূহ মূলগতভাবে সনাতন সমাজবিন্যাস থেকেই এসেছে।

অধ্যাপক শ্যামলাল তাঁর গবেষণা গ্রন্থে অব-সংস্কৃতায়ন (De-sanskritization) ধারণার উপস্থাপনা করেছেন। তাঁর মতে, ভারতীয় জাতি-ব্যবস্থায় সচলতা বিশ্লেষণে 'সংস্কৃতায়ন' ধারণার প্রয়োগে শুধুমাত্র উর্দ্ধমুখী সচলতার দিকটি উল্লেখিত হয়েছে। সমাজতাত্ত্বিকেরা নিম্নমুখী সচলতার দিকটিকে অগ্রাহ্য করেছেন। অধ্যাপক শ্যামলাল তাঁর গবেষণা গ্রন্থে উঁচু জাতি থেকে সামাজিক স্তরবিন্যাসের একেবারে 'নীচুতে' অবস্থিত 'ভাঙ্গি' জাতিতে অধঃগমনের তথ্য উল্লেখ করেছেন, এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি 'অব-সংস্কৃতায়ন' ধারণার উপর ভিত্তি করে 'অস্পৃশ্যকরণ' তত্ত্বের উপস্থাপনা করেছেন।

অধ্যাপক কে. এল. শর্মার মতে, এখন অনেক সময় দেখা যায় যে ব্রাহ্মণ বা

Scanned with CamScanner

রাজপুতদের মতো উচ্চজাতের মানুষেরা অস্পৃশ্যদের স্পর্শ করতেও ইতস্তত করে না। অনেক ক্ষেত্রে জাঠদের নিম্নজাতভুক্ত মানুষের সাথে ভাগাভাগি করে তামাক সেবন করতেও দেখা গেছে। এসব থেকে বোঝা যায় উচ্চজাতের মানুষের সঙ্গে নিম্নজাতের মানুষের মিথস্ক্রিয়া তুলনামূলকভাবে অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে।

সংস্কৃতায়নই ভারতবর্ষের জাতি-ব্যবস্থায় সচলতার পেছনে মূল চালিকা শক্তি— এম. এন. শ্রীনিবাসের এই ধারণার সঙ্গে সবাই একমত নাও হতে পারেন। কারও কারও মতে, ভারতবর্ষের সমাজ পরিবর্তনের ব্যাখ্যা হিসেবে অধ্যাপক শ্রীনিবাসের এই বিবর্তনবাদী বিশ্লেষণ শ্রেণিবিশ্লেষণের দিকটিকে উপেক্ষা করেছে। অধ্যাপক যোগেন্দ্র সিংয়ের মতে, কাঠামোগত পরিবর্তন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'সংস্কৃতায়ন' ধারণার সীমাবদ্ধতা অস্বীকার করা যায় না। তবে একথা সবাই স্বীকার করেন যে ভারতীয় জাতি-ব্যবস্থার সচলতা বিশ্লেষণে অধ্যাপক এম. এন. শ্রীনিবাসের গবেষণা-সঞ্জাত 'সংস্কৃতায়ন' ধারণার উপস্থাপনা ভারতীয় সমাজতত্ত্বে মর্যাদা দান করেছে।

❑ জাতি-ব্যবস্থায় পরিবর্তন

ভারতীয় সমাজে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত জাতি-ব্যবস্থায় নানা দিকে থেকে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। অধ্যাপক এস. সি. দুবের মতে, জাতি-ব্যবস্থা টিকে থাকার ও নতুন করে শক্তি সঞ্চয়ের অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়েছে। এ পর্যন্ত যত আঘাত এসেছে, এই ব্যবস্থা তা সামলে নিয়েছে এবং কালের পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর উপযুক্ত করে তুলেছে। যেমন, ছোঁয়াছুঁয়ির বাধা নিষেধ এখন অনেকটাই শিথিল হয়ে এসেছে। পংক্তিভোজন এবং জাত-পেশার ক্ষেত্রে বাধানিষেধও অনেক কম। অন্যদিকে, রাজনীতির প্রেক্ষাপটে জাতি-ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। হ্যারল্ড গোল্ডের মতে, গ্রাম শহর উভয় সমাজেই জাতি এখনো পুরোপুরি সক্রিয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। তাঁর মতে, শহর ভারতে জাতি স্বার্থগোষ্ঠীর এক জটিল রূপ পরিগ্রহ করেছে। অন্যদিকে, গ্রাম ভারতে জাতি ক্রমোচ্চভাবে বিন্যস্ত, নির্দিষ্ট বৃত্তিভিত্তিক অন্তর্বিবাহ গোষ্ঠীর একটি সংগঠিত ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করছে।

সি. জে. ফুলার সম্পাদিত 'কাস্ট টুডে' গ্রন্থে আড্রিয়ান মেয়ার ভারতের গ্রামে জাতির পরিবর্তন এবং ধারাবাহিকতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। মধ্য ভারতের এক গ্রামীণ এলাকায় জাতি-ব্যবস্থা সম্পর্কে ১৯৫৪ সালে তিনি প্রারম্ভিক সমীক্ষা করেন। পরবর্তীকালে ১৯৮৩ ও ১৯৯২ সালে তিনি একই এলাকায় পুনরায় সমীক্ষা করেন। সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে জাতিসম্পর্কের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনের এক সমন্বিত রূপ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ প্রসঙ্গে সমপাংক্তেয়তা, বৃত্তি নির্বাচন, প্রভৃতির কথা তিনি বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন।

অধ্যাপক রাম আহুজা মনে করেন, স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষের জাতি কাঠামোর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। অন্তর্বিবাহ, জাত-পেশা গ্রহণের বাধ্যবাধকতা, সমপাংক্তেয়তা, শুদ্ধ-অশুদ্ধ ধারণা, প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটেছে। জাতি-পরিষদের (caste-council)

Scanned with CamScanner

ক্ষমতা এবং প্রভাবেও পরিবর্তন দেখা গেছে। তবে, অধ্যাপক আহুজার মতে, বংশানুক্রমিক সদস্যপদ এবং ক্রমোচ্চ শ্রেণি বিভাগের ক্ষেত্রে তেমন কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি।

জাত-ব্যবস্থায় পরিবর্তনের পেছনে কয়েকটি উপাদানের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—

☆ শিল্পায়ন

ব্রিটিশ শাসিত ভারতে জাতি-ব্যবস্থার আর্থনীতিক ভিত অনেকটাই ভেঙে পড়ে। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির আওতায় এসে গ্রাম সমাজের যজমানি ব্যবস্থাও ক্রমেই অবলুপ্ত হতে থাকে। ফলে সামাজিক ক্ষেত্রেও জাতিপ্রথা দুর্বল হয়ে পড়ে। বিশ্বযুদ্ধ-উত্তরকালে ভারতীয় সমাজ কৃষি ও হস্তশিল্প নির্ভর সরল সমাজ ব্যবস্থা থেকে ক্রমশ শিল্পায়নের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এর ফলে গ্রাম থেকে শহরাভিমুখে অভিবাসন (migration) শুরু হয়। অর্থাৎ শিল্পায়নের সাথে সাথে নগরায়নও শুরু হয়। ভারতীয় সমাজ যতই শিল্পায়ন ও নগরায়নের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে ততই জাতিভিত্তিক পেশাগুলির উপযোগিতা হ্রাস পেতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতীয় সমাজে জাতি কাঠামোর পরিবর্তনের পেছনে শিল্পায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এম. এন. শ্রীনিবাস এ প্রসঙ্গে পশ্চিমীকরণের (West-ernization) কথা উল্লেখ করেছেন।

☆ নগরায়ন

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে শিল্পায়নের সাথে সাথে নগরায়নও সনাতন জাতি ব্যবস্থার উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলতে শুরু করে। শহুরে জীবনধারায় জাতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। শহরে সামাজিক গতিশীলতা অনেক বেশি থাকে। বিভিন্ন জাতির লোক কলকারখানায় পাশাপাশি কাজ করে, এর ফলে তাঁদের মানসিকতা, আচার-আচরণ এবং মূল্যবোধ পরিবর্তিত হয়। বৃহত্তর ক্ষেত্রের সামাজিক মেলামেশাকেও তা প্রভাবিত করে। স্বাভাবিকভাবেই শুচিতা-অশুচিতার ধারণা দুর্বল হয়ে পড়ে। কিংসলে ডেভিসের মতে, নগরজীবনের সচলতা, অজ্ঞাত পরিচয়তা, ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতা প্রভৃতি জাতি-ব্যবস্থার কার্যকারিতাকে প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব করে তুলেছে। অধ্যাপক এম. এন. শ্রীনিবাসের মতে, নগরায়নের ফলে জাতিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ সম্পর্কিত বাধানিষেধ বেশ খানিকটা দুর্বল হয়েছে। অধ্যাপক জি. এস. ঘুরেও মনেকরেন, শহর জীবনের বিকাশের ফলে জাতি-ব্যবস্থার কঠোরতা অনেকটাই শিথিল হয়েছে। তবে কারো কারো মতে, নগরজীবনও জাতিগত গোষ্ঠীচেতনা থেকে মুক্ত নয়। হ্যারল্ড গোল্ড বলেছেন, শহর ভারতে জাতি-ব্যবস্থা স্বার্থগোষ্ঠীর এক জটিল রূপ পরিগ্রহ করেছে।

☆ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা

রাম আহুজার মতে, শিক্ষা মানুষকে উদার, যুক্তিবাদী ও গণতান্ত্রিক করে গড়ে তোলে।

Scanned with CamScanner

শিক্ষিত মানুষ জাতি ব্যবস্থার নিয়ম কানুনগুলি অন্ধভাবে অনুসরণ করে না। তাঁরা, সাধারণত, কোনো কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অতি প্রাকৃত আবেগ বা ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হন না। অন্যদিকে, আবার কেউ কেউ মনে করেন, শিক্ষিতদের মধ্যে এমন লোকের অভাব নেই যাঁরা 'নীচু' জাতির মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক যথাসম্ভব পরিহার করে চলেন।

☆ আধুনিক অর্থব্যবস্থা

জাতপাতগত বৈষম্যের সামাজিক ভিত্তিকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে আধুনিক অর্থব্যবস্থার ভূমিকা যথেষ্ট। এখনকার অর্থনীতিক জগতে জাত সম্পর্কিত বিচার বিবেচনা আগের মতো গুরুত্ব পায় না। জাতি নির্দিষ্ট পেশার যুগ এখন অতিক্রান্ত। বর্তমান সমাজে ব্যক্তি অর্জিত গুণাবলীর সাহায্যে নিজস্ব পছন্দ অপছন্দের বিবেচনায় পেশা নির্বাচন করার কথা ভাবতে পারে।

এখনকার সমাজে ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণে জাত পরিচয় অপেক্ষা আর্থিক সামর্থ্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

☆ আধুনিক আইন ব্যবস্থা

বর্তমান ভারতীয় সমাজে আইন ব্যবস্থা জাতিভিত্তিক বৈষম্যকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে। ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ। সংবিধান অনুযায়ী এই দেশে আইনের চোখে সকল নাগরিকই সমান। এছাড়াও স্বাধীন ভারতবর্ষে সাংবিধানিক রক্ষামূলক বৈষম্য (Protective discrimination)-এর মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জাতি ও শ্রেণিগুলির অনগ্রসরতা দূর করার চেষ্টা করা হয়েছে।

❑ উপসংহার

অধ্যাপক এস. সি. দুবের মতে, সনাতনী ও আধুনিক—এই দুই ধরনের মানসিকতার টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। অধ্যাপক আঁদ্রে বেতেও মনে করেন, পরিবর্তনের স্রোতধারা একমুখী নয়, কখনো কখনো তা আবার পরস্পর বিরোধী হয়েও দাঁড়ায়। অধ্যাপক বেতে ধর্মীয় মূল্যবোধের সঙ্গে জাতি প্রথার নিবিড় সম্পর্ককে অস্বীকার করেননি। তবে তাঁর মতে, যত দিন যাচ্ছে জাতি ধর্মীয় ভিত্তি ছেড়ে সমাজ-রাজনৈতিক ভিত্তি গ্রহণ করছে।

অধ্যাপক আঁদ্রে বেতে সাবেকী 'ইন্দোলজিকাল' দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দ্রুত পরিবর্তনশীল আধুনিক ভারতীয় সমাজ-পরিবর্তন ধারাকে বিশ্লেষণ করার পক্ষপাতী নন। তাঁর মতে, ভারতবর্ষে সমাজ-পরিবর্তনের প্রভাব এক অর্থে স্তরবিন্যাসের 'নিম্নবর্গের' জাতিগুলির ওপরই পড়েছে বেশি। এর অন্যতম কারণ হল এরা অতীতে অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি নিশ্চল ছিল।

Scanned with CamScanner

❑ জাতি ও রাজনীতি (Caste and Politics)

স্বাধীন ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ধরনের শাসন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে জাতিপ্রথা নতুন ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছে। এস. সি. দুবের মতে, গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থায় জনসমর্থন সংগঠিত করতে সামাজিক ভিত্তি দরকার। জাতি-সংহতি, জাতি-আনুগত্য সেই কারণে বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব পাচ্ছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সংখ্যাগত সুবিধা অনেকক্ষেত্রেই জাতি-গোষ্ঠীগুলি ভোগ করছে। সেই কারণে নির্বাচনে জনসমর্থন সংগ্রহ করতে জাত-পাতের রাজনীতি এখন এক বহুল ব্যবহৃত কৌশল হিসেবে দেখা দিয়েছে। জাতি-বৈরিতার সঙ্গে ক্ষমতার রাজনীতি মিশে যাওয়ায় ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

আঁদ্রে বেতের মতে, ভারতবর্ষে প্রথম দিকে রাজনীতি উচ্চবর্ণের মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরে তা আর উচ্চবর্ণের লোকেদের মধ্যেই সীমিত থাকল না। সমাজের বৃহত্তর অংশের মানুষের মধ্যে তা প্রসারিত হল। অনগ্রসর জাতি-গোষ্ঠীর লোকেরা বুঝতে পারল সংগঠিত রাজনীতির গুরুত্ব কতটা। আঁদ্রে বেতের মতে, ভারতীয় সামাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের চেয়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে। ওয়াইনারের মতে, ভারতীয় সমাজে দারুণভাবে রাজনীতিকরণ হয়েছে। সমাজে ব্যক্তিগত উন্নতির ক্ষেত্রে রাজনীতি এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়েছে। তবে, কারো কারো মতে, নিম্নবর্ণের জাতিগুলির অধিকাংশ সদস্যই দরিদ্র ও নিরক্ষর, ফলে সংগঠিত রাজনীতির প্রকৃতি ও কৌশল সম্বন্ধে তাঁদের তেমন কোনো ধারণা নেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে, জাতি গোষ্ঠীগুলির সুবিধাভোগী অংশই (creamy layer) আরও সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে। পাশাপাশি বিহারের মতে রাজ্যে উচ্চবর্গীয়দের হাতে নিম্নবর্গীয় মানুষের নির্যাতনের ঘটনাও তেমন কমছে না। তবে, একথা স্বীকার করতে হবে যে ভারতবর্ষের সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন এবং সাম্প্রতিক পঞ্চায়েতীরাজের ফলে নিম্নজাতির পুরুষ মহিলারা সহজেই রাজনৈতিক ক্ষমতার কাছাকাছি পৌঁছতে পারছে। সনাতনী সমাজে এটা সম্ভব ছিল না।

ভারতীয় সংবিধানে নিম্নবর্গের জাতিগুলির জন্য 'সাময়িক ভাবে' সংরক্ষণ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সংবিধান রচয়িতাদের মতে, অনগ্রসর জাতিগুলির জন্য সাময়িকভাবে সংরক্ষণ চালু করলে তা সাম্যের ধারণার পরিপন্থী হবে না বরং তা পরিপূরক ভূমিকা পালন করবে। একে 'রক্ষামূলক বৈষম্য' (Protective discrimination) বলে অভিহিত করা হয়েছে। একটি পত্রিকার সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়েছে যে, সংবিধান প্রণেতারা যখন এই প্রথাকে স্বাধীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করেন তখন তাঁরা একে সামাজিক ন্যায়ের এক প্রকরণ হিসেবে দেখেছিলেন। এর ওপর সংকীর্ণ ও দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক স্বার্থের সোপান রচনা করতে চাননি। সেই লক্ষ্যটি দ্রুত অন্তর্হিত হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে, পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে সংরক্ষণ ব্যবস্থা সত্ত্বেও পিছিয়ে পড়া জাতিগুলির উন্নয়ন সূচকের উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন হয়নি। ওই সম্পাদকীয়তে মত প্রকাশ করা হয়েছে যে, রাজনৈতিক সুবিধাবাদ নয়, একমাত্র প্রকৃত

Scanned with CamScanner

রাজনৈতিক সদিচ্ছাই এক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম।

❑ জাতি ও শ্রেণি (Caste and Class)

বিশ্বের সকল সমাজের মতোই ভারতবর্ষের সমাজও আবহমান কাল ধরে নানাভাবে স্তরবিন্যস্ত। এই স্তরবিন্যস্ত কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটছে। সামাজিক স্তরবিন্যাস প্রধানত দু-ধরনের—বদ্ধ শ্রেণি ব্যবস্থা (closed class system)। এবং মুক্ত শ্রেণি ব্যবস্থা (open class system)। সাধারণভাবে বলা হয় জাতি ভিত্তিক শ্রেণি হচ্ছে বদ্ধ শ্রেণি ব্যবস্থা। কারও কারও মতে, বংশ পরিচয় যখন শ্রেণি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাধান্য প্রায় তখনই শ্রেণি জাতিতে পরিণত হয়। অধ্যাপক ম্যাকাইভারের মতে, যখন সামাজিক পদমর্যাদা এমনভাবে পূর্ব নির্ধারিত থাকে যে মানুষের জন্মগত অবস্থানকে ভাগ্যফল হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং যা পরিবর্তনের আশাই আর করা হয় না, তখনই শ্রেণি জাতির চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করে। রবার্ট বায়ারস্টেডের মতে, বদ্ধ শ্রেণি ব্যবস্থা ও জাতি ব্যবস্থা সমার্থক।

☆ জাতি ও শ্রেণির মধ্যে পার্থক্য

১। জন্মসূত্রে জাতির সদস্যপদ নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ তার জন্ম এবং মৃত্যু একই জাতির মধ্যে সীমিত। কোনও বিশেষ জাতির সদস্য অন্য কোনো জাতির সদস্য হতে পারে না। স্বভাবতই, ক্ষেত্রে সামাজিক সচলতার পথ রুদ্ধ থাকে। এই কারণেই জাতিপ্রথা বদ্ধ সমাজ ব্যবস্থার প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়। জাতি যেহেতু জন্মভিত্তিক ও বংশানুক্রমিক তাই জতিগত মর্যাদা আরোপিত (ascribed status)। পক্ষান্তরে, কোনো একটি শ্রেণির সদস্য অর্জিত গুণাবলীর সাহায্যে অন্য কোনো উঁচু বা নীচু শ্রেণিতে লীন হতে পারে। তাই শ্রেণিগত মর্যাদা 'অর্জিত' (achieved status)। এই কারণে শ্রেণি উন্মুক্ত ব্যবস্থার প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়। এক্ষেত্রে সামাজিক স্তরবিন্যাসে আরোহণ-অবরোহণের সম্ভাবনা অর্থাৎ সামাজিক সচলতার পথ উন্মুক্ত থাকে। এস. আর. মহেশ্বরীর মতে, জাতি সামাজিক কারণে স্থানু আর শ্রেণি অর্থনৈতিক কারণে গতিশীল।

২। জাতি অন্তর্বিবাহ গোষ্ঠী অন্যদিকে শ্রেণি তা নয়। অর্থাৎ জাতির সদস্যদের নিজ জাতির মধ্যেই বিবাহ করতে হয়, ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ। অন্যদিকে, কোনো বিশেষ শ্রেণির সদস্যর অন্য শ্রেণিতে বিবাহ করার ক্ষেত্রে সামাজিক বিধিনিষেধের কড়াকড়ি নেই।

৩। জাতি পেশাভিত্তিক গোষ্ঠী। জাতি ও পেশা ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং বংশানুক্রমিক। জাতিগোষ্ঠীর সদস্যদের সমষ্টিগত চেতনা এই যে পেশা জন্ম বা ভাগ্য দ্বারা পূর্বনির্ধারিত। সেই কারণে পেশা অপরিবর্তনীয়। পক্ষান্তরে, শ্রেণির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পেশা গ্রহণের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

Scanned with CamScanner

৪। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় জাতির ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। জাতিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই বিধিনিষেধ কার্যকরী হতে দেখা যায়। সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, খাদ্য-পানীয় গ্রহণ, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি ক্ষেত্রে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের জাতিগুলির মধ্যে ব্যবধান স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে, সামাজিক স্তরবিন্যাসের আধুনিক রূপ হল শ্রেণি। শ্রেণির ক্ষেত্রে এই ধরণের অপরিবর্তনীয় কঠোর নিয়মবিধি দেখা যায় না।

৫। জাতি রক্ষণশীল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পরিচয় বহন করে। এই ব্যবস্থায় সমাজ হয় ঐতিহ্য অনুসারী। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের কোনো প্রয়াসই এ ধরনের কৃষি ভিত্তিক সমাজে সমর্থন পায় না। অনেকের মতে, জাতি ব্যবস্থায় ব্যক্তির কর্মপ্রেরণা ও সৃজনশীলতা উৎসাহ পায় না বলেই এই ব্যবস্থা উন্নতি ও প্রগতির অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে, শ্রেণিভিত্তিক শিল্প সমাজ ততটা রক্ষণশীল হয় না। কারো কারো মতে, ভারতবর্ষে ধনতন্ত্রের বিকাশ না হওয়ার অন্যতম কারণ হল জাতি-ব্যবস্থা।

৬। জাতি-ব্যবস্থা ভিত্তিক সমাজে প্রতিযোগিতার তেমন কোনো স্থান নেই। এখানে ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা ও বৃত্তি জন্মসূত্রে নির্ধারিত। সেই কারণে এ ধরনের সমাজে প্রতিযোগিতার প্রয়োজন নেই বললেই চলে। পক্ষান্তরে, শ্রেণিভিত্তিক সমাজ প্রতিযোগিতা নির্ভর। সামাজিক স্তরবিন্যাসে আরোহণ-অবরোহণ নির্ভর করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার অর্জিত ফলের উপরে।

৭। জাতি বিন্যাসের ক্ষেত্রে দেবতাত্ত্বিক ধারণার অভিব্যক্তি থাকলেও শ্রেণি বিন্যাসের ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। অর্থাৎ জাতিভেদ প্রথার ধর্মীয় ভিত্তি থাকলেও শ্রেণিভেদ তুলনামূলকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ।

আধুনিকতা ও সনাতনী ধারণা—এই দুইয়ের টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই ভারতীয় সমাজে পরিবর্তন হচ্ছে। এর ফলে, ভারতীয় সমাজে শিল্পায়নের সাথে সাথে ক্রমশ অর্থনৈতিক শ্রেণির উদ্ভব হলেও তার মধ্যে জাতির বৈশিষ্ট্য একেবারে অবলুপ্ত হচ্ছে না। অধ্যাপক এস. সি. দুবের মতে, জাতপাত কেন্দ্রিক সনাতন গোষ্ঠী আনুগত্য এখনও ভারতীয় সমাজের ভিত্তিতে শিকড় গেড়ে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, জাতি ভিত্তিক সামাজিক মর্যাদার মতো এখনকার শ্রেণিভিত্তিক সামাজিক মর্যাদাও অনেকাংশে 'আরোপিত'। আধুনিক শ্রেণি সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেও একথা বলা যায় যে উচ্চবিত্ত পরিবারগুলির সন্তানেরাও সাধারণত তাদের পারিবারিক মানমর্যাদার অধিকারী হয় এবং তুলনামূলকভাবে সমাজে বেশি সুযোগ সুবিধা লাভ করে। আবার দেখা যায়, আধুনিক সমাজে বিশেষ করে বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'জাতি-পরিচয়ের' গুরুত্ব এখনো খুব কমেনি। অন্যদিকে, অধ্যাপক এম. এন. শ্রীনিবাসের মতো সমাজতাত্ত্বিকরা একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে ভারতবর্ষের জাতি ব্যবস্থা কখনোই পুরোপুরি 'বদ্ধ সমাজের' প্রতীক ছিল না। 'সংস্কৃতায়ন' প্রক্রিয়ার কারণে জাতিগুলির সামাজিক গতিশীলতা ও মর্যাদাগত পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হত। সেই অর্থে, ভারতবর্ষের তথাকথিত 'বদ্ধ সমাজে'ও আধুনিক উন্মুক্ত সমাজের কিছুটা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল।

Scanned with CamScanner